৩০ বছর বয়স্ক পুরুষ ১২ বছর বয়স্কা নারীকে বিবাহ করবে এবং ২৪ বছর বয়স্ক পুরুষ ৮ বছর বয়স্কা নারীকে বিবাহ করবে। 'অর্থশাস্ত্রে' নারী ও পুরুষদের বিবাহ অবশ্য কর্তব্য বলে উল্লিখিত আছে। এতে বৈবাহিক চুক্তিরও উল্লেখ আছে। সমাজে জাতি বা বর্ণভেদ-প্রথা কঠোর থাকায় দুই বর্ণ বা জাতিভুক্ত নর-নারীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। 'অর্থশাস্ত্রে' এইরূপ বিবাহের নিন্দা করা হয়েছে। অবশ্য 'মনুসংহিতায়' বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দুই বর্ণের মধ্যে বিবাহ স্বীকৃত আছে। তবে এধরনের বিবাহের শর্ত ছিল এই যে, নিম্নবর্ণের পুরুষ উচ্চবর্ণের নারীকে বিবাহ করতে পারত না।

বর্ণবিবাহ

'অর্থশাস্ত্রে' আট প্রকারের বিবাহের বর্ণনা আছে, যথা—ব্রহ্ম-বিবাহ, প্রজাপত্যয়-বিবাহ, আর্য-বিবাহ, দৈব-বিবাহ, গান্ধর্ব-বিবাহ, অসুর-বিবাহ, রাক্ষস-বিবাহ ও পৈশাচ-বিবাহ। 'মনু সংহিতায়' অসুর ও পৈশাচ বিবাহের নিন্দা করা হয়েছে। 'অর্থশাস্ত্রে' এই আট প্রকারের বিবাহের মধ্যে কোনটিকেই নিন্দা করা হয় নি বটে, তবে প্রথমোক্ত চার প্রকারের বিবাহ সমর্থিত আছে। 'অর্থশাস্ত্রে' নারী ও পুরুষদের পুনর্বিবাহ সমর্থিত আছে। স্ত্রী বন্ধ্যা হলে বা কোন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ না করলে পুরুষ পুনরায় বিবাহ করতে পারত। নারীরাও স্বামীর জীবিতাবস্থায় পুনরায় বিবাহ করার অনুমতি পেত। অবশ্য কৌটিল্য প্রথমোক্ত চার প্রকারের বিবাহ অবিচ্ছেদ্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন।

বিভিন্ন প্রকারের বিবাহ

পুনরায় বিবাহ

বহুবিবাহ-প্রথা প্রাচীন কালে বহুল প্রচলিত ছিল। 'অর্থশাস্ত্রে'ও বহুবিবাহ-প্রথা সমর্থিত হয়েছে। গ্রীক লেখকরাও বহুবিবাহ-প্রথার উল্লেখ করেছেন। মেগাস্থিনিসের কথায়, "ভারতীয়রা অগণিত সন্তান-সন্ততির জন্য যত খুশি বিবাহ করত।" 'অর্থশাস্ত্রে' বহুবিবাহের উল্লেখ থাকলেও একসময় একাধিক পুরুষকে স্বামীত্বে গ্রহণ করার উল্লেখ নেই।

বহুবিবাহ

'অর্থশাস্ত্রে' বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথারও উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের মতে "স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠলে বিবাহ-বিচ্ছেদ স্বীকৃতি লাভ করবে।" প্রাচীন ভারতের সমাজে গণিকাবৃত্তি মোটেই নিন্দনীয় ছিল না। 'অর্থশাস্ত্রে' 'গণিকা' ও 'রূপজীবিকা'-র উল্লেখ আছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে নারীরা কখনও কখনও গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করত। আবার কখনও কখনও তারা স্বেচ্ছায় এই বৃত্তি গ্রহণ করত। গণিকাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা হত। এদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'গণিকাধ্যক্ষ' নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত থাকতেন। 'গণিকাধ্যক্ষরা' গণিকাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতেন এবং তাদের ওপর কর ধার্য করতেন। গণিকাদের নৃত্য, সঙ্গীত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করা হত। গণিকাদের পুত্র-কন্যাদের রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা ও অভিনেত্রী হিসেবে উপযুক্ত করে তোলা হত।

বিবাহ-বিচ্ছেদ

গণিকাবৃত্তি

অন্যান্য আলোচনা : উপরোক্ত আলোচনাদি ছাড়াও 'অর্থশাস্ত্রে' জনসাধারণের অবস্থা, সামাজিক আচার-ব্যবহার, ক্রীড়াকৌতুক প্রভৃতি বিষয়েরও আলোচনা আছে।

গুপ্তযুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতি

গুপ্তযুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অপূর্ব বিকাশ ঘটে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক থেকে বিচার করে বার্নেট গুপ্তযুগকে গ্রীসের পেরিক্লিসের যুগের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অন্যদিকে স্মিথ গুপ্তযুগকে ইংল্যাণ্ডের এলিজাবেথ ও স্টুয়ার্ট যুগের সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্মিথের মতে

পেরিক্লিস ও এলিজাবেথের যুগের সঙ্গে গুপ্তযুগের তুলনা

সেক্সপীয়রের মনীষা যেমন ইংল্যাণ্ডের অপরাপর সাহিত্যসেবীদের প্রতিভা ম্লান করেছিল, তেমনি ভারতে কালিদাসের প্রতিভার কাছে অন্যেরা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু স্মিথের এইরূপ মন্তব্য যথার্থ বলে স্বীকার করা যায় না। সেক্সপীয়রের আবির্ভাব না হলেও এলিজাবেথ যুগের সাহিত্য গৌরব অর্জন করত। ভারতেও কালিদাস ভিন্ন অনেক প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যসেবীদের অবদানে ভারতের সাহিত্য সমৃদ্ধ হত, এতে সন্দেহ নেই।

গুপ্তরাজদের বিদ্যোৎসাহিতা

গুপ্ত-সম্রাটদের অনেকেই বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃতির পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত কেবল শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন তা নয়, তিনি নিজেও একজন প্রতিভাবান কবি ছিলেন। যদি কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন হন, তা হলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক বলা যেতে পারে। স্মিথের মতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতের ভাব-আদর্শের বিনিময়ের ফলেই ভারতীয় মনীষার এক অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রচলন

গুপ্তযুগে সংস্কৃত ভাষা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। কিন্তু তাই বলে একথা বলা যায় না যে, এই যুগে সংস্কৃত ভাষার পুনরভ্যুদয় ঘটে। বস্তুত গুপ্তপূর্ব যুগে সংস্কৃত ভাষা কখনই বিস্মৃত বা অবহেলিত হয় নি। মৌর্যযুগে সংস্কৃত ভাষা রাষ্ট্রভাষা ছিল না বটে, কিন্তু তাই বলে এই ভাষার ব্যবহার অপ্রচলিতও ছিল না। অনেকের মতে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সময় বচিত পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য', রুদ্রদমনের বিখ্যাত 'জুনাগড়-শিলালিপি', অশ্বঘোষ ও চরক রচিত গ্রন্থাদি সংস্কৃত ভাষাতেই লেখা হয়। সুতরাং গুপ্তযুগের অনেক আগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা লাভ করে। গুপ্তরাজারা ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় এর অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। এই যুগের অধিকাংশ লিপিগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। হরিষেণ কর্তৃক রচিত ' এলাহাবাদ-প্রশস্তি' একখানি সুললিত কাব্যের মত শ্রুতিমধুর। এই কাব্যের ভাষা বহুকালের সাধনার ফল। সুতরাং আকস্মিকভাবে এই ভাষার উন্নতি হয় নি।

এই যুগে 'মহাভারত' ও পুরাণগুলির সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন হয় এর ফলে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধিত হয়। বহু প্রাচীনকাল থেকেই 'মহাভারতে' কাহিনী প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বেই 'ধর্মশাস্ত্র', 'পুরাণ' লেখকদের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু গুপ্তযুগে 'মহাভারত' ও পুরাণগুলির সম্পাদনা এমনভাবে করা হয় যা এক সম্পূর্ণ নতুন সাহিত্যের রূপ পরিগ্রহ করে। হিন্দুদের কাছে 'মহাভারতে'র গুরুত্ব অনস্বীকার্য, কারণ তা ভারতবাসীর জাতীয় ঐতিহ্য, ধর্ম এবং রাজনৈতিক ও নৈতিক বোধের এক বিশাল ভাণ্ডার। পূর্ববর্তী যুগে কৃত 'মহাভারতে'র ভাষ্য এখন প্রায় অজ্ঞাত এবং 'পুরাণ' সম্পর্কেও সে কথা বলা চলে। জাতীয় স্বার্থে গুপ্তযুগে 'ভাগবৎ', 'স্কন্দ', 'মৎস্য', 'বায়ু' ও 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ' নতুন করে রচিত হয়। অনেকের মতে 'মহাভারত' ও পুরাণগুলির নব-সম্পাদনা ও রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তিসাধন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি জনগণকে আকর্ষণ করা। কিন্তু এ ধরনের ভাবনা-চিন্তা অসার বলে মনে হয়। কারণ গুপ্তযুগেই সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রসার ঘটে এবং 'বুদ্ধ-চরিত', 'সৌন্দরানন্দ' প্রভৃতি বৌদ্ধ কাব্যগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই যুগেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব ভারতের সর্বত্র বিস্তারলাভ করে। একথাও মনে রাখা দরকার যে, গুপ্তযুগের পরেও প্রায় চারশ বছর ধরে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ মঠ প্রভৃতির প্রতি আপামর জনগণের যথার্থ শ্রদ্ধা ছিল। সুতরাং 'মহাভারত' ও পুরাণগুলির নব কলেবরে সম্পাদনার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জীবন থেকে কুষাণ, গ্রীক, পহ্লব প্রভৃতি বিদেশী জাতিগুলির প্রভাব দূর করা এবং ভারতীয়ত্ববোধ সঞ্চারে গুপ্ত সম্রাটদের কালজয়ী অবদান সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণীয়।

গুপ্তযুগে বহুসংখ্যক খ্যাতনামা সাহিত্যিক, কবি ও দার্শনিকদের আত্মপ্রকাশ হয়। এদের মধ্যে কালিদাস * ছিলেন অন্যতম। কালিদাস রচিত 'শকুন্তলা', 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব', 'ঋতুসংহার', 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' প্রভৃতি নাটকগুলি বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। শকুন্তলা-নাটকে কালিদাসের প্রতিভার চরম প্রকাশ পাওয়া যায়। 'মৃচ্ছকটিক'-গ্রন্থের রচয়িতা শূদ্রক সম্ভবত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে জীবিত ছিলেন। 'মৃচ্ছকটিক'-নাটকটি সংস্কৃত সাহিত্যের একখানি অমূল্য গ্রন্থ। বিশাখদত্ত রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' ও বিষ্ণুশর্মা রচিত 'পঞ্চতন্ত্র'—এই যুগের অপর মূল্যবান গ্রন্থ। 'মুদ্রারাক্ষস' থেকে চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্য কর্তৃক মগধের সিংহাসনলাভের বিবরণ পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, কাত্যায়ণ ও বৃহস্পতি প্রমুখ মনীষীদের রচিত স্মৃতিশাস্ত্রগুলিও এই যুগে রচিত হয়। কমন্দকের 'নীতিসার' সম্ভবত গুপ্তরাজাদের এক মন্ত্রী কর্তৃক রচিত হয়। এই যুগেই বৌদ্ধায়ণ, উপবর্ষ, ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রমুখ খ্যাতনামা দার্শনিকরা তাঁদের বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থগুলি রচনা করেন। বৌদ্ধ দার্শনিকরাও শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। বসুবন্ধু রচিত 'হীনযান' ও 'মহাযান' বৌদ্ধ দর্শন-গ্রন্থ, প্রমর্থ-রচিত 'বসুবন্ধুর জীবনী', চন্দ্রগোমিন-রচিত 'চন্দ্রব্যাকরণ' প্রভৃতি এই যুগের উল্লেখযোগ্য রচনা। এই যুগের অপর খ্যাতনামা গ্রন্থকার ছিলেন 'এলাহাবাদ-প্রশস্তির' রচয়িতা ও সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ। হরিষেণ ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের সেনাপতি ও পররাষ্ট্র-মন্ত্রী।

গুপ্তযুগের মনীষীরা

এই যুগেই সাংখ্যদর্শনের নবরূপায়ণ ঘটে। ভার্যগগণ্য ও ঈশ্বরকৃষ্ণের মূল্যবান টীকা এই যুগেই রচিত হয়। সুতরাং দর্শন-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও গুপ্তযুগ ছিল সমৃদ্ধ।

বিজ্ঞান ঃ সাহিত্য ছাড়াও জ্যোতিষ, গণিত, রসায়ন প্রভৃতি জ্ঞানবিজ্ঞানেও ভারতীয় মনীষার অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। আর্যভট্ট ও বরাহমিহির ছিলেন এই যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। আর্যভট্ট রচিত 'সূর্য-সিদ্ধান্ত' নামক গ্রন্থে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের কারণের মনোরম বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি গ্রহ-উপগ্রহগুলির অবস্থিতি সম্পর্কেও মনোজ্ঞ বিবরণ রেখে গেছেন। বরাহমিহির রচিত 'বৃহৎ-সংহিতা' ও 'পঞ্চসিদ্ধান্ত' নামক গ্রন্থে গ্রীক ও রোমান জ্যোতিষশাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং এইরূপ অনুমান করা যেতে পারে যে, ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা রোমান ও গ্রীক সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রেও এইযুগে যথেষ্ট প্রসার ঘটে। সম্ভবত শল্য-চিকিৎসাও এই যুগে প্রচলিত ছিল এবং অনেকের মতে শল্যবিদ্যায় পারদর্শী সুশ্রুত গুপ্তযুগেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

আর্যভট্ট, বরাহমিহির, সুশ্রুত প্রমুখ

শিক্ষার ক্ষেত্রেও ভারত এই যুগে অনগ্রসর ছিল না। রাওয়ালপিণ্ডির অনতিদূরে অবস্থিত তক্ষশীলা নগরটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। চরকের শিষ্য শল্যবিদ্যায়

---

* **কালিদাস ঃ** কালিদাস কোন্ সময় জীবিত ছিলেন সে বিষয়ে মতভেদ আছে। একদল ঐতিহাসিকের মতে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে জীবিত ছিলেন। এর সমর্থনে বলা হয়েছে যে, (১) কালিদাস বিক্রম-সম্বদের প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিক্রমের সমসাময়িক ছিলেন। (২) তিনি শুঙ্গ-রাজত্বকালের অনেক ঘটনার উল্লেখ করেছেন; সুতরাং তিনি শুঙ্গ-রাজাদের সমসাময়িক ছিলেন। (৩) অশ্বঘোষ ও কালিদাসের রচনার মধ্যে বহু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

অপর ঐতিহাসিকদের মতে গুপ্তযুগেই কালিদাসের আবির্ভাব হয়েছিল এবং সম্ভবত তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। এই মতের সমর্থনে বলা হয় যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং এই দিক থেকে তিনি বিক্রম-সম্বৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিক্রমের সমসাময়িক ছিলেন এইরূপ অনুমান করা যায়। সিলভিন লেভী, জ্যাকোবি প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে খ্রীষ্টীয় ৪৭০ অব্দের পূর্বেই কালিদাসের আবির্ভাব হয়েছিল।

কিংবদন্তী অনুসারে কালিদাস ছিলেন ব্রাহ্মণসন্তান। বাল্যকালে পিতৃহীন হলে এক গো-সেবক তাঁকে পালন করেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন নিরক্ষর কিন্তু সুদর্শন। কথিত আছে যে, এক রাজমন্ত্রীর কৌশলে রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এর পর তিনি নিজ অধ্যবসায় বলে খ্যাতনামা কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

পারদর্শী জীবকের জীবনী থেকে জানা যায় যে, বুদ্ধদেবের সময়েও তক্ষশীলা সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও চীন, গ্রীস, ইরান, মিশর প্রভৃতি দেশ থেকে বহু শিক্ষার্থী শিক্ষালাভের জন্য তক্ষশিলায় আসতেন। তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদ, ব্যাকরণ, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য ও শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্র ও শিক্ষক হিসেবে পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, জীবক, চাণক্য প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতের বহু নৃপতি ও সামন্তরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ করতেন। এ ছাড়া কণিষ্কের রাজধানী পুরুষপুর (পেশোয়ার) বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। 'ধর্মপদ' থেকে জানা যায় যে, মহলি নামক এক লিচ্ছবী-যুবক তক্ষশিলার শিক্ষা সমাপ্ত করে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারকল্পে নিজজীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

শিক্ষা

ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা ছাড়াও সেই যুগের বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করত, যদিও সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদের হাতেই নিবদ্ধ ছিল। বিশেষ বিশেষ ধরনের শিল্প-নিগমগুলির সদস্যদের শিল্প-সংক্রান্ত কারিগরী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। এই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল খনিজ, ধাতব, বুনন (Weaving) ও রঞ্জনী-বিদ্যা শিক্ষা। এই সকল শিক্ষার অগ্রগতি মুদ্রা ও মৌর্য আমলের স্তম্ভে লক্ষ্য করা যায়। এ ভিন্ন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিষয়ক শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা ছিল।

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্পর্শের ফলে এই যুগে জ্যোতিষশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্রেও যথেষ্ট অগ্রগতি হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চরক ও শুশ্রুতের নাম উল্লেখযোগ্য। এই যুগেই ভেষজবিদ্যা অভাবনীয় অগ্রগতি লাভ করে এবং তা গ্রীকদের মাধ্যমে পশ্চিমী জগতের জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই প্রসঙ্গে গ্রীক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ (Botanist) থিওফ্রাসস্টস্ (Theophrastus)-এর রচিত গ্রন্থ 'উদ্ভিদের ইতিহাস' (History of Plants) গ্রন্থখানি উল্লেখ করা যায়। এই গ্রন্থে তিনি ভারতীয় উদ্ভিদের এক বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।

বিজ্ঞান ঃ ডাক্তার বিভূতিভূষণ দত্তের মতে আধুনিক বীজগণিতের আকার ও ভাব মূলত ভারতীয়দের কীর্তি। হিন্দুরা বীজগণিত ও অব্যক্তগণিত এই দুই নামেই এই শাস্ত্রকে অভিহিত করত। অব্যক্তগণিতের অর্থ অজ্ঞাত রাশির গণনা বিজ্ঞান, আর বীজ শব্দের অর্থ মূল বা কারণ। ঋণাত্মক সংখ্যা (negative number) প্রয়োগের জন্য জগৎ হিন্দুদের কাছে ঋণী। প্রথম ধন (positive) ও ঋণ সংখ্যাকে যথাক্রমে ঋক্ ও অনৃক বা হৃত ; পরবর্তী যুগে ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখ গণিতজ্ঞরা এদের ধন ও ঋণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। বীজগণিতে সমীকরণ (equation) শব্দও প্রথম হিন্দু গণিতজ্ঞ ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ) আবিষ্কার করেন। প্রাচীন ভারতীয় গণিতে চার রকমের সমীকরণের উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ (১) এক বর্ণ সমীকরণ, (২) অনেক বর্ণ সমীকরণ, (৩) মধ্যমাহরণ ও (৪) ভাবিত (simple, simultaneous, quadratic equation and equation involving products of two unknown quantities)।

বর্গ সমীকরণে অজ্ঞাত সংখ্যার ধন ও ঋণ এই দুটি মূল্য বের হতে পারে, একথা হিন্দু গণিতজ্ঞ পদ্মনাভ আবিষ্কার করেন। শ্রীধরাচার্য ও পদ্মনাভের লেখা গণিতের পুস্তক এখনও পাওয়া যায়নি। ভাস্করাচার্যের গ্রন্থে এঁদের নাম ও উপরি-উক্ত আবিষ্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্গ সমীকরণে ভাস্করাচার্যের প্রণালী শ্রীধরাচার্যের প্রণালী থেকে ভিন্ন এবং তা বর্তমানে প্রচলিত প্রণালীরই অনেকটা অনুরূপ। ভারতীয়গণ বর্গ সমীকরণের পূর্ণ সমাধান করতে পারত। অনিশ্চিত একবর্ণ সমীকরণ (indeterminate equation of the first degree) বা কুট্টকের সমাধান আর্যভট্টের গ্রন্থেই পাওয়া যায়।

আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর, পদ্মনাভ ও ভাস্করাচার্য বীজগণিতে এমন সব প্রশ্নের সমাধান করেছেন যা অনেক পরে ইওরোপে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুনরায় আবিষ্কৃত হয়েছে।

ত্রিকোণমিতিতেও প্রাচীন ভারতের অবদান যথেষ্ট। এলফিন্‌স্টোন তাঁর ভারত-ইতিহাসে লিখেছেন, 'সূর্যসিদ্ধান্তে ত্রিকোণমিতির এমন সব পদ্ধতি রয়েছে যা গ্রীকরা জানত না, শুধু তাই নয়, এমন অনেক সমস্যার সমাধান রয়েছে যা ইওরোপে ষোড়শ শতাব্দীর আগে আবিষ্কৃত হয়নি।' সূর্যসিদ্ধান্তের বহু পূর্বে ভারতবর্ষে জ্যামিতির চর্চা হয়েছিল। 'হিন্দুরা ত্রিকোণমিতিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান জিনিস্ দান করেছে। বাস্তবিকপক্ষে তাদের দান এতটা মৌলিক ধরনের যে তাদের স্থান আধুনিক ত্রিকোণমিতির বিজ্ঞানের সূচনা বলা যেতে পারে।'

জ্যোতিষশাস্ত্রেও ভারতবাসী বিশেষ পারদর্শী ছিল। বৈদিকযুগ থেকেই ভারতে জ্যোতিষের চর্চা শুরু হয়। আজ চন্দ্র আকাশে যে জায়গায় আছে ২৭/২৮ দিন পরে আবার সে জায়গায় ফিরে আসবে এবং চন্দ্র যে সূর্যের আলোতেই তেজোময় একথা বৈদিক ঋষিরা জানতেন। এক পূর্ণিমা বা অমাবস্যা থেকে অপর পূর্ণিমা ও অমাবস্যা পর্যন্ত ত্রিশবার সূর্যোদয় হয় লক্ষ্য করে তাঁরা ত্রিশ দিনে মাস স্থির করেন। পরে অবশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করে বুঝতে পেরেছিলেন যে, চান্দ্র মাস ঠিক ত্রিশ দিনে নয়, কিছু কম। তাঁরা আরো লক্ষ্য করেছিলেন যে, কোনো একটি নক্ষত্র থেকে যাত্রা শুরু করলে সূর্য ৩৬৫ দিনে আবার তার সঙ্গে একত্র হয় অর্থাৎ ৩৬৫ দিনে বছর। কিন্তু বারো চান্দ্র মাসে ৩৬৫ দিন হয় না ; প্রতি তিন বছরে প্রায় এক মাস কম পড়ে। অতএব চান্দ্র ও সৌর বছরের সামঞ্জস্য করার জন্য তাঁরা প্রতি তিন বছরে একটি 'মল' মাস কল্পনা করে নেন।

'অনুলোমগতির্নৌস্থ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সম পশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্।।'

পৃথিবী গোলাকার একথা বৈদিক ঋষিরা জানতেন। পরবর্তী যুগে ভারতীয়রা ভূগোলক কল্পনা করেছিল। ব্রহ্মগুপ্তের সময় এমন কি তার আগেও লঙ্কাকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল ধরে তারা কল্পনা করত। ভাস্করাচার্যে রয়েছে—'লঙ্কা কুমধ্যে যমকোটিরস্যাঃ প্রাক্ পশ্চিমে রোমক পত্তনং চ।' আজকাল আমরা যে ভূগোল পড়ি তাতে গ্রীনিচ-কে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল ধরে ভূগোলক কল্পনা করা হয়। কিন্তু লঙ্কাকে কেন্দ্র ধরে ভূগোল লিখলেও ভূগোলের কোনো ত্রুটি হয় না।

প্রাচীন ভারতের মনীষা অঙ্কশাস্ত্রে যেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে চিকিৎসাশাত্রেও কৃতিত্ব নেহাৎ কম ছিল না। চিকিৎসাবিজ্ঞান ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল, ঋগ্বেদেই ব্যবসায়ী চিকিৎসকদের উল্লেখ আছে। বর্তমানে 'চরক' ও 'সুশ্রুত' এই দুটিই কবিরাজদের প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ। চরকের গ্রন্থ থেকে জানা যায় বিভিন্ন দেশ থেকে আগত চিকিসকদের সম্মিলনী হত এবং সেই সম্মিলনীর সিদ্ধান্তসমূহ চরকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তক্ষশীলা খুব প্রাচীনকাল থেকেই চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। 'চরক' ও 'সুশ্রুত' কোন্ সময়ে রচিত এ বিষয়ে মতভেদ আছে। সিলভাঁ লেভী পঞ্চম শতাব্দীর চৈনিক ত্রিপিটক থেকে চরক নামে একজন চিকিৎসক কণিষ্কের সভায় ছিলেন এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। ফলে অনেকে সিদ্ধান্তও করেছেন যে চরক ছিলেন কণিষ্কের সমসাময়িক লোক। সুশ্রুতের বর্তমান সংস্করণ নাগার্জুন কর্তৃক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। হয়ার্নলে ও বিউহলার সুশ্রুতকে পঞ্চম শতাব্দীর লোক বলে মনে করেন। কাত্যায়নের বার্তিকে সুশ্রুতের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু সেই

সুশ্রুতই যে প্রসিদ্ধ সুশ্রুত একথা নিশ্চিত বলা চলে না। যদি তা হয় তবে সুশ্রুত খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর লোক। সুশ্রুতের কাল সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিত কিছু বলা যায় না, তবে তা চরকের পরে রচিত হয়েছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

চরকে অস্ত্র-চিকিৎসার কথা নেই, সুশ্রুতে এর বিশেষ উল্লেখ আছে। প্রাচীনকালে শব-ব্যবচ্ছেদ প্রত্যেক কবিরাজী শিক্ষার্থীর অবশ্য কর্তব্য ছিল, কিন্তু সেই কাজ হাতে কলমে করলে পর জাতি-ধর্ম নষ্ট হবে এই বিশ্বাস কিছুদিন আগে অনেক লোকের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। তাই প্রথম যখন কলকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয় তখন শব-ব্যবচ্ছেদ করার জন্য ছাত্রের অভাব হয়েছিল। প্রাচীন কালে শুধু যে অস্ত্র-চিকিৎসা প্রচলিত ছিল তা নয়, এ বিদ্যায় তাঁরা বেশ পারদর্শীও ছিলেন। ম্যাক্‌ডোনেলের মতে আধুনিক ইওরোপ তাঁদের কাছ থেকে অস্ত্রোপচার করে নাকের গড়ন ভালো করার প্রণালী (Rhinoplasty) শিক্ষা করেছে। অর্শ, পাথুরী ও ভগন্দর রোগে অস্ত্র করার কথা 'সুশ্রুতে' আছে। সাধারণ ভাবে সন্তান প্রসব না হলে প্রসব করানো এবং অস্ত্রোপচার দ্বারা জরায়ু থেকে সন্তান বের করার প্রণালী ভারতীয় কবিরাজরা জানতেন। এ সবের ফলে ভ্রূণতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁদের যথেষ্ট জ্ঞান হয়েছিল।

অস্ত্র-চিকিৎসকদের লক্ষণ এরকম দেওয়া আছে ঃ যে অস্ত্র-চিকিৎসকের বল, ক্ষিপ্রকারিতা, তীক্ষ্ণ অস্ত্র, পরিশ্রমে ঘর্মহীনতা, অস্ত্রের কম্পনরাহিত্য এবং ভ্রূণের পক্কাপক্কাদি অবস্থা নিরূপণে জ্ঞান আছে সেই ব্যক্তি অস্ত্রচিকিৎসা কার্যে প্রশস্ত বলে বিবেচিত হবে।'

প্রাচীনকালে কায়-চিকিৎসায় ভারতীয় কবিরাজদের খুবই কৃতিত্ব ছিল। যে সব ব্যাধি গ্রীক চিকিৎসকরা আরোগ্য করতে পারতেন না সে সব আরোগ্য করার জন্য সম্রাট আলেকজাণ্ডার তাঁর শিবিরে ভারতীয় চিকিৎসক নিযুক্ত করেছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতে বাগদাদের খলিফা হারুন-অল-রশীদের রাজত্বের সময় তাঁর চিকিৎসার জন্য ভারতবর্ষ থেকে মানকা নামক একজন চিকিৎসক গিয়েছিলেন। ভারতীয় চিকিৎসকরা শুধু আরবে নয় মিশর দেশ পর্যন্ত চিকিৎসা করতে যেতেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ হিউয়েন সাং ও ইৎসিং-এর বিবরণী এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ভগ্নাবশেষ থেকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বর্তমান পাটনা জেলায় অবস্থিত ছিল। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবের চরম শিখরে ওঠে। তদানীন্তন ভারতের তা ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। আধুনিক কালের অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, হারবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মতো নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ও সে যুগে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করেছিল।* খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত-সম্রাটগণ কর্তৃক বৌদ্ধ-সঙ্ঘ হিসেবে এর প্রতিষ্ঠা হয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নৃপতি ও বিত্তশালীদের চেষ্টায় ও অর্থে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক শিক্ষার কেন্দ্র রূপে খ্যাতিলাভ করে।

---

* সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। প্রাচীন কেরল রাজ্যে বৈদিক ধর্মশাস্ত্রে শিক্ষা দেওয়ার জন্য দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ ছাড়া তক্ষশীলা ও উজ্জয়িনীতেও দুটি বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষাদানের জন্য তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়টি এক সময় প্রসিদ্ধি লাভ করে। নালন্দার সন্নিকটে অবস্থিত বিক্রমশীলার বিশ্ববিদ্যালয়টি এক সময় শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। সম্ভবত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে হূনগণ কর্তৃক তক্ষশীলা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়টি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

আটটি বিভিন্ন কলেজ বা শিক্ষায়তন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি গঠিত ছিল। এগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পৃষ্ঠপোষকগণ কর্তৃক স্থাপিত হয়। এদের মধ্যে শ্রীবিজয় (সুমাত্রা) রাজ্যের রাজা

নালন্দার বিভিন্ন শিক্ষায়তন

বালপুত্রদেবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলেজগুলি ছিল সারিবদ্ধ। যশোধর্মদেবের অনুশাসনলিপিতে শিক্ষায়তনগুলির গঠন-প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়টি শুধু সুরম্য-অট্টালিকার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল না। সেখানে ছাত্রদের পঠন-পাঠনেরও সুবন্দোবস্ত ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি লাইব্রেরী বা পাঠাগার ছিল। এগুলির নাম ছিল (১) 'রত্নসাগর', (২) 'রত্নদধি' ও (৩) 'রত্নরঞ্জক'। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করত। এদের মধ্যে অনেকে ছিল বহিরাগত—

বিদেশী ছাত্র

যেমন, মধ্য-এশিয়া, চীন, কোরিয়া, সিংহল, জাপান প্রভৃতি দেশের ছাত্রগণ। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করত। ইৎসিং-এর বিবরণীতে হুই-নিয়ে ও আর্যবর্মণ নামে দুজন কোরিয় পণ্ডিতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শুধু যে বিদেশী ছাত্র ও পণ্ডিতরাই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন তা নয়, এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও বহু ছাত্র ও পণ্ডিত বিশ্বের অন্যান্য স্থানে গিয়ে বৌদ্ধধর্মবিস্তারে

বৌদ্ধধর্ম বিস্তারে সহায়ক

যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। তিব্বতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত পণ্ডিতদের মধ্যে সংরক্ষিত, পদ্মসম্ভব, কমলশীল, বুদ্ধকীর্তি প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বস্তুত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের প্রধান কেন্দ্র ছিল। বৌদ্ধদের কাছে এই বিদ্যায়তন ছিল পরম পবিত্র-ভূমি। অবশ্য কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের পঠন-পাঠন ছাড়াও

পঠন-পাঠন

বেদ, ব্যাকরণ, ন্যায়, আয়ুর্বেদ, গণিত ও বিবিধ ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলত। হিউয়েন সাং-এর সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন বাঙ্গালী পণ্ডিত শীলভদ্র। অধ্যক্ষ রূপে ধর্মপাল, জিনমিত্র, বসুবন্ধু, প্রভামিত্র, আর্যদেব প্রমুখের নামও পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে দিবারাত্রি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলত। তথায় শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল।

শিক্ষা-স্বাধীনতা

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছাত্ররা একত্রে অধ্যয়ন ও আলোচনার সুযোগ লাভ করত। বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক-আলোচনা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। হিউয়েন সাং বহুবার এইরূপ বিভিন্ন বিষয়ের বিতর্ক আলোচনায় যোগদান করেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একমাত্র স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্ররাই ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেত। পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র গ্রহণ করা হত এবং এইরূপ পরীক্ষার মান ছিল উচ্চ। হিউয়েন

শিক্ষার উচ্চ মান

সাং-এর কথায় "বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করার উদ্দেশ্য নিয়েই দেশ-দেশান্তর থেকে পণ্ডিতরা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন।" সুতরাং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান যে খুবই উচ্চ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহের জন্য তার নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। প্রায় ১৮০ টি গ্রামের আয় থেকে নালন্দার ব্যয় নির্বাহ হত।

নালান্দার আয়

ইৎ-সিং-এর ভারতভ্রমণের পরও প্রায় পাঁচ শতাব্দী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব বজায় ছিল। এর পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বৌদ্ধধর্মেরও অবক্ষয় ঘটে।

নালন্দার অবক্ষয়

দক্ষিণ-ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ঃ উত্তর-ভারতের মত দক্ষিণ-ভারতেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছিল। উত্তর-ভারতের মত দক্ষিণ-ভারতেও হিন্দু মনীষায় উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগে দক্ষিণ-ভারতে কাব্য, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প প্রভৃতি

বিষয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থাদি রচিত হয়। দক্ষিণ-ভারতে শিক্ষার মান খুবই উন্নত ছিল। উত্তর-ভারতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত কাঞ্চীর বিশ্ববিদ্যালয় ছিল দক্ষিণ-ভারতের শিক্ষার প্রধান পীঠস্থান। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দক্ষিণ-ভারতীয় মনীষার বিকাশ ঘটে। কাঞ্চীর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও সেই যুগে দক্ষিণ-ভারতে বহু বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় কৃষ্ণের বিদেশমন্ত্রী কর্তৃক স্থাপিত সালগোতি মহাবিদ্যালয়ের উল্লেখ করা যায়। এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস সাতাশটি পৃথক পৃথক আবাস নিয়ে গঠিত ছিল। উচ্চ-বেতনভোগী অধ্যাপকরা এই মহাবিদ্যালয়ে নিযুক্ত ছিলেন। এই মহাবিদ্যালয় আঞ্চলিক জনগণের আর্থিক সাহায্যপুষ্ট ছিল। সালগোতি মহাবিদ্যালয় ছাড়া, শিক্ষার অপর অন্যতম কেন্দ্র ছিল এনাইরাম-মন্দির-মহাবিদ্যালয়। এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল সাড়ে তিন শত। ছাত্রদের পঠন-পাঠন অবৈতনিক ছিল এবং দর্শনে বিভিন্ন বিষয়ের পঠন-পাঠন চলত। দক্ষিণ-ভারতের প্রতিটি উল্লেখযোগ্য মন্দিরের সঙ্গে কলেজ বা মহাবিদ্যালয় সংযুক্ত ছিল। দক্ষিণ-ভারতের রাজবংশগুলি শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং নৃপতিদের অনেকেই সুসাহিত্যিক ছিলেন। সাতবাহনদের রাজত্বকালে রচিত গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' ও সাতবাহন-রাজ-এর রচিত 'সপ্তশতক' গ্রন্থ দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য ও রামানুজ ছিলেন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং দর্শনশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার। 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' নামক জ্যোতিষ ও গণিত গ্রন্থ-প্রণেতা ভাস্করাচার্য, 'কিরাতার্জুনীয়' কাব্যের রচয়িতা ভারবি, 'কাব্যদর্শন' নামক গ্রন্থের রচয়িতা দন্ডী, 'বিক্রমাংকদেবচরিত' গ্রন্থের রচয়িতা বিহ্লন, 'মিতাক্ষর' গ্রন্থের রচয়িতা বিজ্ঞানেশ্বর প্রমুখ মনীষীদের দ্বারা দক্ষিণ-ভারতীয় সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধ হয়েছিল। রাষ্ট্রকূট-রাজ অমোঘবর্ষ কর্তৃক রচিত 'রত্নমালিকা', পল্লব-রাজ মহেন্দ্র বর্মণ কর্তৃক রচিত 'মত্তবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থাদিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বৈষ্ণব ও শৈব ভক্তদের রচিত স্তোত্র-সংগীতমালা ভারতের ভক্তিমূলক সাহিত্যে বিশেষ স্থানের অধিকারী। দক্ষিণ-ভারতের সাহিত্যের ক্ষেত্রে তামিল ভাষায় তিরুবল্লুবর কর্তৃক রচিত 'কুরল' নামক গ্রন্থখানি এক অমূল্য সম্পদ। এটি একটি ভক্তিমূলক গ্রন্থ। এছাড়া তামিল ভাষায় বহু সংগীত ও নাট্য-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদিও সেই যুগে রচিত হয়েছিল।

পারসিক কবিতা ও সাহিত্য

সুলতানি সাহিত্য ঃ ভারতীয় ও ইসলামী সংস্কৃতির পরস্পর প্রভাবের ফল সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। দিল্লীর সুলতান ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন আমীর খস্রু। তিনি বলবন, আলাউদ্দিন খাল্জী ও গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন। তিনি 'হিন্দুস্থানের তোতাপাখি' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ ও কবি। হিন্দু-ধর্মের মূল আদর্শের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল গভীর। মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম হিন্দী শব্দ ব্যবহার করেন এবং ভারতীয় কাব্যের অনুকরণে কাব্য রচনা করেন। সুলতানি আমলের আর একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন হাসান দেহল্‌বি। তিনি আমীর খস্রুর সমসাময়িক ছিলেন।

আমীর খস্রু, হাসান দেহল্‌বি

সুলতানি আমলে ইতিহাস-সাহিত্য রচনা উৎকর্ষ লাভ করেছিল। মিন্‌হাজ '(তবকাতে-নাসিরি'), জিয়াউদ্দিন বারণী ('তারিখে ফিরোজ শাহী'), শাম্‌সে-আফিফ ('তারিখে-ফিরোজশাহী') প্রমুখ ঐতিহাসিকদের রচনায় সুলতানি আমলের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। খাল্‌জী ও তুঘলক আমলের ইতিহাসের জন্য বারণী রচিত গ্রন্থটি এক অমূল্য উপাদান। সুলতানি যুগের ইতিহাস রচনায় পারসিক রীতি অনুসরণ করা হয়। তবে এই ইতিহাস চর্চায় দরবারী রাজনীতিকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

ঐতিহাসিক সাহিত্য

মুসলমানদের মধ্যে ফার্সী ভাষার সাহিত্যই ছিল শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু। মুসলমান লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ সংস্কৃত ভাষার প্রতিও অনুরাগী ছিলেন। ফিরোজ তুঘলক ও সিকান্দার লোদীর আদেশে কিছু সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ

সমসাময়িক হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক মিলনের ফলেই উর্দু ভাষার উৎপত্তি হয়। আরবী ও ফার্সী ভাষা থেকে এর লিপি ও শব্দ উদ্ভুত হলেও এর ব্যাকরণ সংস্কৃত ভাষাশ্রয়ী।

উর্দু ভাষার উৎপত্তি

এইযুগে হিন্দি সাহিত্যও উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এই যুগের হিন্দি সাহিত্য-সেবীদের মধ্যে পার্থসারথি মিশ্র, দেবসুরী, জীব-গোস্বামী, গঙ্গাধর, জীমূতবাহন, বিজ্ঞানেশ্বর, বাচম্পতি মিশ্র প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ধর্ম, দর্শন, ন্যায় ও আইন সম্পর্কে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। সুলতানি আমলের শেষের দিকের ধর্ম-আন্দোলনের ফলে প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য উৎকর্ষ লাভ করেছিল। সুলতানি আমলে বাংলা ভাষার যথার্থ উন্নতি হয়েছিল। ঐতিহাসিক কে. আর. কানুনগো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে এই সময়কে সৃজনশীল অধ্যায় বলে অভিহিত করেছেন (Muslim rule in Bengal was the most important formative period of Bengali literature and of the evolution of the language itself–Islam and its impact on India. পৃঃ ৪৫)।

হিন্দি-সাহিত্য

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

বাংলার সুলতানদের মধ্যে হুসেন শাহ্ ও নসরৎ শাহ্ বাংলার সাহিত্যের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু 'শ্রীমদ্ভাগবত গীতা' বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ-র পৃষ্ঠপোষকতায় কবি পরমেশ্বর 'মহাভারতের' বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। পরাগল খাঁ-র পুত্র ছুটি খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকর নন্দী 'মহাভারতের অশ্বমেধ' পর্বটির বঙ্গানুবাদ করেন। নসরৎ শাহ্ও 'মহাভারতের' বঙ্গানুবাদ করিয়েছিলেন। কৃত্তিবাসের অমূল্য গ্রন্থ 'রামায়ণ', বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' এবং বৈষ্ণব পদাবলীর অধিকাংশই এই যুগে রচিত হয়েছিল। বৈষ্ণব পদাবলীগুলি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

সুলতানি আমলের শেষের দিকে ধর্ম-আন্দোলনের ফলে পাঞ্জাবী ও মারাঠী ভাষারও যথার্থ উন্নতি হয়েছিল। নানক ও তাঁর শিষ্যদের চেষ্টায় পাঞ্জাবী ভাষার উন্নতি হয়। জ্ঞানেশ্বর, একনাথ প্রমুখ মারাঠী গ্রন্থকারদের রচনার মাধ্যমে মারাঠী ভাষা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। মারাঠী সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামদেবেরও উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

পাঞ্জাবী এবং মারাঠী ভাষা ও সাহিত্য

হিন্দি সাহিত্যের বিকাশে সুলতানি যুগের প্রভাব অনস্বীকার্য। এই যুগের শ্রেষ্ঠতম কবি আমীর খসরু হিন্দি সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। এছাড়া মুল্লা দাউদ, কুতুব শেখ, মালিক মহম্মদ জৈসী প্রমুখ হিন্দি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

[বাংলা ও বিজয়নগর রাজ্যের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিস্তৃত বিবরণ ঃ তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।]

সুলতানি যুগে বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্র ঃ সুলতানি যুগে দিল্লী নগরীতে পশ্চিম ও মধ্যএশিয়া থেকে বণিক্ ও বৌদ্ধিক শ্রেণীর আগমন ঘটে। মোঙ্গল জাতি মধ্যএশিয়া ও ইরান দখল করার ফলে সেখান থেকে শিক্ষিত মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা দিল্লীতে আশ্রয় নেয়। বুখারা থেকে আগত সাদিদ উদ্দিন মহম্মদ আওয়াফি (Awfi)র বিবরণ থেকে জানা যায় ইলতুৎমিস-এর রাজত্বকালে কিভাবে দিল্লীতে এই সব পলাতক ব্যক্তিরা আশ্রয় নেয় এবং তাদের আগমনের ফলে মধ্যএশিয়া ও পারস্যের

সংস্কৃতি ভারতে প্রসারিত হয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, ইতিমধ্যে ইসলামীয় সভ্যতা বিভিন্ন দেশ থেকে বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানের জ্ঞান ভাণ্ডার চয়ন করতে সক্ষম হয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিচর্চা বিকশিত হয়। আমীর খসরুর রচনা থেকে জানা যায় যে, সেই সময় ভারতে জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ প্রচলন ছিল। জিয়াউদ্দিন বারানির লেখা থেকে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে দিল্লীর সুলতানগণ বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহ দিতেন। বারানির মতে মৌলানা হামিদ উদ্দিন মুত্রিজ ছিলেন সেই সময়ের সবচেয়ে খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিদ্। জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে দিল্লীর কৃতিত্ব বাগদাদ ও কাইরোর সমধিক।

সুলতানি যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্বকাল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক ইকতিদার হোসেন সিদ্দিকি মনে করেন তিনি বিস্তারনীতি পরিহার করে সহায়সম্পদ সংরক্ষণে বেশী আগ্রহী ছিলেন। তাঁর রাজধানী ফিরোজাবাদ জ্যোতির্বিদ্যার পীঠস্থানে পরিণত হয়। তিনি যে মানমন্দির নির্মাণ করেন তা উৎকর্ষের দিক দিয়ে বিশেষ খ্যাতিলাভ করে।

ফিরোজ শাহ তুঘলকের মৃত্যুর পর দিল্লীর সুলতানি শাসন ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়লেও লোদী সুলতানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ধারা অব্যাহত রাখেন। এছাড়া, দাক্ষিণাত্যের বাহমনী রাজ্যে বিজ্ঞান চর্চার প্রসার পরিলক্ষিত হয়। সুলতান তাজউদ্দিন ফিরোজ শাহ অঙ্ক, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। দৌলতাবাদের কাছে তিনি একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। জৌনপুরের শারকি সুলতানগণও বিজ্ঞানচর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। পানি মহল (water-palace) ও স্বয়ংক্রিয় ঘড়ি এ সময়ের উচ্চমানের প্রযুক্তিবিদ্যার স্বাক্ষর বহন করে।

চিকিৎসাবিদ্যা ঃ আরবগণ অষ্টম শতকে ভারতে প্রবেশ করার পর তাদের নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতি ও চিকিৎসকদের ভারতে নিয়ে আসে। এই চিকিৎসা পদ্ধতি ইউনানি নামে পরিচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পারসিক ও গ্রীকগণ প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র দ্বারা প্রবাভিত হয়। অন্যদিকে আরবগণ গ্রীক চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করতো।

সুলতানি যুগে আলাউদ্দিন খাল্‌জী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাকিম নামক চিকিৎসকদের নিয়োগ করতেন। মহম্মদ বিন তুঘলক ব্যক্তিগত ভাবে চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। কথিত আছে তিনি দিল্লী ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে ৭০টি হাসপাতাল স্থাপন করেছিলেন। এদিকে পরবর্তীকালে বাহমনি রাজ্যে ও তার উত্তরসূরী বিজাপুর রাজ্যে সংস্কৃত ভাষায় রচিত চিকিৎসা গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়। তবে, সামগ্রিকভাবে সুলতানি যুগে ভারতের চিরায়ত আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ব্যবস্থা হ্রাস পেতে থাকে এবং হিন্দু উচ্চবর্গীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল।